সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা

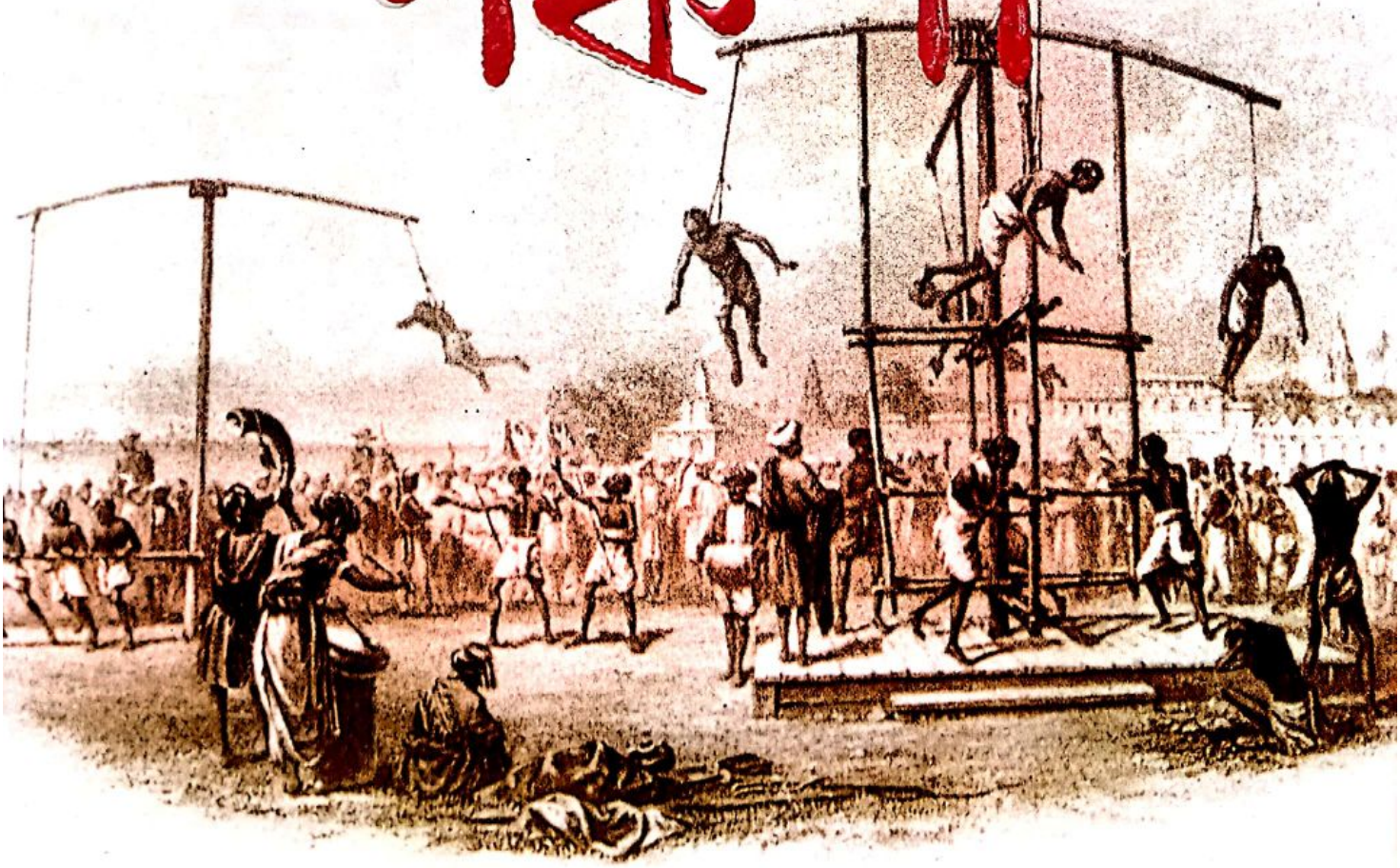

সম্পাদনা • অরুণ নাগ

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

শহর কলকাতার উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' অবশ্যপাঠ্য। উনিশ শতক, কলকাতা এবং বাঙালিয়ানা, তিনটিই হুতোমের নকশার অপরিহার্য চরিত্রলক্ষণ, তবু তাদের মধ্যে প্রধান কে যদি এ প্রশ্ন ওঠে, বলতে হয় বাঙালিয়ানা, হাড়ে-মজ্জায় এমন একটি বাঙালি বই খুব বেশি লেখা হয়নি। তৎকালীন শহুরে বাঙালির আচরণ, মানসিকতা, ভাষা, লেখক হাজির করেছেন অন্তরঙ্গ কথনের ধরনে, যে মেজাজটিও বাঙালি। সমাজের হরেক দিক তো আছেই, তার সঙ্গে সমসাময়িক ঘটনা ও ছদ্মবেশে বাস্তব চরিত্রের উপস্থিতি তির্যক ব্যঙ্গকে আরও লক্ষ্যভেদী করে নকশাকে পাঠকের কাছে অধিকতর স্বাদিষ্ট করে তুলেছে। সিপাহি বিদ্রোহ কিংবা নীল বিদ্রোহের মতো নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে গিয়েও হুতোম ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ঘটনা কিংবা চরিত্রের নিছক বিবরণে হুতোমের রুচি নেই, ভালমানুষদের স্থান নেই তাঁর রচনায়, বিদ্রূপযোগ্য নয় এমন চরিত্র নকশায় এসেছে শুধু পটভূমিকা ভরাট করার প্রয়োজনে। এতৎসত্ত্বেও নকশা যে নির্জলা 'কুচ্ছো' বা ভাঁড়ামোয় পরিণত হয়নি, তার কারণ হুতোমের অসাধারণ সাহিত্যিক-মুনশিয়ানা, যা নকশাকে লোকোত্তর চরিত্র দিতে পেরেছে।

হুতোমকে নতুন করে আসরে নামাতে গেলে একটা কৈফিয়ত দেওয়ার থাকে, আজকের দিনে নকশার প্রাসঙ্গিকতা কী? ঊনবিংশ শতক সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী বা সেই সময়ের সাহিত্য বিষয়ক গবেষকদের যে প্রয়োজন আছে, বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া হুতোমের নকশার প্রথম প্রকাশকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সোয়া'শ বছর ধরে ধারাবাহিক প্রকাশ প্রমাণ করে তার স্থায়ী চাহিদা একটা আছে।

কিন্তু নকশার পাঠকরা কি একই রস উপভোগ করছেন এত বছর ধরে? তা নিশ্চয় নয়। কারণ নকশা যখন লেখা হয়েছিল পাঠকরা সকল শব্দের অর্থ জানতেন, চিনতেন ছদ্মবেশী চরিত্রগুলিকে, গূঢ়ার্থক অংশের তাৎপর্য বুঝতে পারতেন। ধীরে ধীরে বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে সব, আজকের পাঠক অল্পাংশই চিনে-জেনে পড়ছেন। নিঃসন্দেহে আজকের জনপ্রিয়তার নকশার নিরপেক্ষ সাহিত্যগুণই প্রমাণিত হচ্ছে, তবু হুতোমের নকশার পুরনো স্বাদের যদি কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়া যায় তারই চেষ্টায় সটীক সংস্করণ প্রকাশ।

দ্বিতীয় কৈফিয়ত, কেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'? খুব বেশি না হলেও, নকশা-সাহিত্যের বেশ কিছু উদাহরণ লভ্য, তাদের মধ্যে থেকে হুতোমকে বেছে নেওয়ার কারণ একটাই, হুতোমের মতো বিষয়-চরিত্র বৈচিত্র্য কারও নেই। তা ছাড়া অন্যরা সমাজের ছবি আঁকতে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এত বেশি যে, অনেক ক্ষেত্রেই রম্য-উপন্যাসের চেহারা নিয়েছে।

Scanned with CamScanner

হুতোমের প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র বাস্তব, সমসাময়িক ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া বাস্তব থেকেই সংগৃহীত, যে বৈশিষ্ট্য অন্য কারও লেখায় মেলে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' আপাদমস্তক নির্ভরযোগ্য সামাজিক দলিলবিশেষ। কারণ, ব্যঙ্গবিদ্রূপ শাণিত করতে, চরিত্রে ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করতে বহুক্ষেত্রেই হুতোম অল্পবিস্তর কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তা ছাড়া চরিত্র বা উৎসবঘটনাদির বর্ণনাও কিঞ্চিৎ একপেশে। এসব সত্ত্বেও খাদের পরিমাণ অন্য নকশাকারের থেকে লক্ষণীয় রকমের কম, যে কারণে হুতোমই প্রথম পছন্দ।

হুতোমের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার (১৮৬২ খ্রি.) পর বাংলায় নকশা সাহিত্যের জোয়ার আসে। 'নক্‌শা' শব্দটি গ্রন্থ নামে কালীপ্রসন্ন প্রথম ব্যবহার করলেও চরিত্রগত দিক থেকে তাঁর মৌলিক অবদান নয়। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ 'বঙ্গসাহিত্যে নকশা' (*পঞ্চপুষ্প*, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন) প্রবন্ধে নকশার মূল চরিত্রলক্ষণ স্থির করেছেন, যথেষ্ট হাস্যরস, সামাজিক অনাচার বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রূপ, সামাজিক দোষ দূর করতে শিক্ষাদান, ব্যঙ্গ জোরদার করতে অতিরঞ্জন, লঘু ভাষা, ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনা ও নাতিদীর্ঘ আকৃতি, নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে এর সঙ্গে যুগলক্ষণকেও যোগ করা উচিত (*উনিশ শতকের বাংলা নক্‌শা*, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৪)। বলা বাহুল্য কোনও একটি নকশায় সব কয়টি লক্ষণ উপস্থিত নাও থাকতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ, লঘু ভাষা ও পর্যাপ্ত হাস্যরস সাধারণত থাকেই। এখন পর্যন্ত জানা আছে 'বাবুর উপাখ্যান' নামক সমাচার দর্পণে (২৪.২. ও ৯.৬. ১৮২১ খ্রি.) প্রকাশিত রচনাটি বাংলা নকশা সাহিত্যের আদি উদাহরণ। হুতোম তাঁর রচনার পূর্বে প্রকাশিত নকশা যেমন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রি.), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রি.) প্রভৃতি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কি না সন্দেহ, কারণ, হুতোমের চলিত ভাষার স্বচ্ছতা, বর্ণনায় ডিটেলস বা অনুপুঙ্খের সমারোহ, পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রতি মনোযোগ তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে একমাত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এই (১৮৫৮ খ্রি.) কিছুটা মেলে।

হুতোম টেকচাঁদ ঠাকুরের একাধিক রচনা থেকে সোজাসুজি গল্প ও বিশিষ্ট প্রকাশ (expression) ধার করেছেন (দ্র. ২৯৬, ৩০০ ও ৪৪৫ টীকা), যেজন্য টেকচাঁদ-পুত্র চুনিলাল মিত্র, 'টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র' ছদ্মনামে তাঁর 'কলিকাতার নুকোচুরি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'হুতুমের নক্সাখানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে মহোদয় টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পূর্ণরূপে বলিতে হইবে', যা অতিরঞ্জিত, তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অনুরূপ ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল কি না তাও জানা নেই, তবে চার্লস ডিকেন্সের *Sketches by Boz* জাতীয় রচনা হয়তো পড়ে থাকতে পারেন (টীকা ৬৪৩ দ্র.)। নকশার দ্বিতীয় গৌরচন্দ্রিকায় হুতোম বলেছেন, নকশা প্রকাশ হওয়াতে সমাজে বজ্জাতির লাঘব হয়েছে বল্লে নিজেদের বড়াই করা হয়, 'কিন্তু এটী সাধারণের ঘরকন্নার কথা *Household Words*', ডিকেন্স এই নামেই (*Household Words*, প্রথম প্রকাশ ১৮৫০

Scanned with CamScanner

খ্রি.) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন, যার অধিকাংশ রচনাই ছিল স্কেচধর্মী। তবে এত সহজভঙ্গুর অনুমানের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সমীচীন নয়। হুতোমের নকশার বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গি যদি প্রভাবিত হয়েও থাকে, তবে তা এতই প্রচ্ছন্ন, হুতোমের স্বকীয় স্পর্শে এতই রূপ পাল্টেছে, যে ধরা দুষ্কর।

হুতোম বলেছেন তাঁর নকশা বঙ্গসাহিত্যের নতুন অলংকার স্বরূপ এবং সমাজের উন্নতি বিধায়ক। কিন্তু শুধুমাত্র এই দুই কারণে হুতোম কলম ধরেছিলেন, পশ্চাৎপট বিচার করলে তা মনে হয় না। ১৮৬৮ খ্রি. প্রকাশিত সংস্করণের সূচিপত্রে প্রত্যেক নকশার আলাদা শিরোনাম এবং 'হুজুক' ও 'বুজরুকি' তার দুটি গুচ্ছ। হুতোম না বললেও প্রকৃতপক্ষে নকশার বিষয় বিভাগ তিনটি, সামাজিক ছবি, হুজুক ও কেচ্ছা, ত্রিধারাই মিলেমিশে আছে। মুখ্যত সামাজিক ছবির উদাহরণ, চড়ক, দুর্গোৎসব ইত্যাদি।

কোনও অজ্ঞাত কারণে হুতোম সব সময়েই সামাজিক ছবি একটি উৎসব উপলক্ষ করে আঁকতে চেয়েছেন, যে বৈশিষ্ট্য তাঁর পূর্বাপর লেখকদের নেই।

হুজুক বলতে আমরা এখন যা বুঝি হুতোমের ধারণা তার থেকে কিছুটা আলাদা, তিনি প্রকৃত ঘটনা, হুজুক ও গুজবের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি। বহুজনজ্ঞাত, শোরগোল-জাগানো যে কোনো বিষয়ই তাঁর কাছে হুজুক, সিপাহি বিদ্রোহ থেকে মরাফেরা, সবই এই শ্রেণির অন্তর্গত। আজকের কমিউনিকেশন রেভল্যুশনের যুগে হুতোমি হুজুকে-কলকাতা কল্পনা করা কষ্টকর, যেখানে মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে সুদূর সম্পর্কযুক্ত উদ্ভটতম গুজবও অনায়াসে বিশ্বাস অর্জন করত। জনতার বৃহদংশের অজ্ঞতাই তার জন্মবৃদ্ধির উর্বর ক্ষেত্র, আর হুজুকের এমনই সম্মোহনী ক্ষমতা যে শিক্ষিত জনও অবশেষে তার শিকার হয়ে পড়েন। বিষয় হিসাবে হুজুক শুধু হুতোমকেই আকৃষ্ট করেনি, সে যুগের বটতলা সাহিত্যিকরাও একাধিক হুজুককে চটি বইয়ের অমরত্ব দিয়ে গেছেন।

তৃতীয় বিষয় কেচ্ছা, যা হচ্ছে কিস্‌সা=কাহিনি ও কুৎসা>কুচ্ছো-র মিলিত রূপ। তৎকালীন সমাজে মুদ্রিতাকারে যে সব কুৎসা প্রচারিত হত তার সঙ্গে হুতোমি কেচ্ছার ফারাক বিস্তর এবং তা বুঝতে সে যুগে কুৎসা সৃষ্টি-প্রচারের কারণ-বিবরণ বলা দরকার। শহর কলকাতার কুৎসা রটনার মূল সূত্র ছিল তার গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে। বঙ্গীয় গ্রামীণ সমাজে কুৎসা ব্যক্তি বিশেষের রুচি বিকৃতি ছিল না, যৌথ প্রচেষ্টায় প্রচারিত ও সময় সময় সৃষ্টও হত। তার বহু প্রমাণ সাহিত্যে রয়ে গেছে, অনেক পরবর্তীকালের রচনাতেও (যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেদার রাজা' প্রভৃতি) তা দেখা যায়। কলকাতা তখনো আকারে ছোট, জনসংখ্যা কম এবং নিষ্কর্মাদের আধিক্য থাকায় একে অপরের, সত্যমিথ্যা যাই হোক, কলঙ্কের খবর অনায়াসেই পেতেন। বাবুদের নিন্দা করা নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল, অপর পক্ষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার মতো দূতেরও অভাব ছিল না, শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের নিন্দাযুদ্ধ পর্যবসিত হত অশ্লীল কুৎসা প্রচারে। হুতোম নিজেই 'রামলীলা' নকশায় বলেছেন 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের 'খেঁউড়ে' জিত ধরাই আছে।' বাবুদের বৈঠকি আড্ডায় মোসাহেবদের

Scanned with CamScanner

দ্বারা যার উৎপত্তি ঘটত, (মোসাহেবরা 'সর্ব্বদাই আষাঢ়ে গল্প, পরের নিন্দা ও নূতন ২ সংবাদ বলিয়া বাবুর অত্যন্ত প্রিয় হয়', *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৬৩ খ্রি.), তার শেষ হত টাকা দিয়ে ছাপিয়ে প্রচার করায়। এই রুচিবিকার এতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল যে বাবুদের দেখাদেখি তাঁদের বংশধররাও এ খেলায় মেতেছিলেন, 'পূর্ব্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত। এক ধনীর পুত্র এক বালকের গ্লানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া থামেতে মারিয়া দেয়। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাণ্ঠান হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন' (*ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত*, প্যারীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১৮৭৮ খ্রি.)। মনে রাখা উচিত 'হুতোম' প্রথম প্রথম খুব চটি বই এর আকারে বাহির হইত। কালীপ্রসন্নের আদেশ ছিল, অতি প্রত্যূষে বাবুদের বাড়ী এক এক খণ্ড যেন বিলি করা হয়। তাঁহার লোকেরা তাহাই করিত' ('কালীপ্রসন্ন-প্রসঙ্গ', অমূল্যচরণ সেন, *অর্ঘ্য*, আশ্বিন, ১৩১৮ সন)। বই ছাপিয়ে কেচ্ছা গাওয়ার ট্র্যাডিশন অনেকদিন চালু ছিল, উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ, যা কুচবিহার-বিবাহ নামে খ্যাত, এবং যা উপলক্ষ করে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়, ঘটলে, বিপক্ষীয় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন আঠাশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ'? আর এক ব্রাহ্ম আনন্দচন্দ্র মিত্র 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে লিখেছিলেন 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি'? নামে শীর্ণকায় ব্যঙ্গ-নাটিকা। শেষোক্তটির নামের সঙ্গে নকশা সাহিত্যের বিচিত্র নাম-সম্ভারের (টীকা ১৪ দ্র.) সাদৃশ্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মনে রাখা উচিত বই ছাপিয়ে কেচ্ছা করার রীতি এতই সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছিল যে রুচিশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর কাছেও ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

তবে হুতোমের সমকালে সামাজিক নীতিবোধ ছিল ভিন্ন, প্রায় সমস্ত কুৎসাই ছিল যৌন ব্যভিচার সংক্রান্ত, ভাষা নিতান্ত অশ্লীল, রচনায় সাহিত্যগুণের লেশমাত্র নেই এবং তা প্রকাশ-প্রচারের জন্য কেউ লজ্জিত হত না। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, যিনি 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর মতো নামকরা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, একই সঙ্গে 'সম্বাদ রসরাজ'-এর মতো অশ্লীল কুৎসা পত্রিকা চালিয়েছেন ন্যূনাধিক আঠারো বছর ধরে। 'রসরাজ'-এর সঙ্গে খেউড়ে পাল্লা দিত 'পাষণ্ড পীড়ন', সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত কবি ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সমাজের সকল নামী পরিবার কোনও না কোনও পক্ষের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, *রসরাজ* গর্বের সঙ্গে তার স্বপক্ষীয়দের নাম জানিয়েছে, ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার, মলঙ্গার দত্ত পরিবার, শিবনারায়ণ ঘোষ, আনন্দনারায়ণ ঘোষ, খেলাতচন্দ্র ঘোষ, রসময় দত্ত প্রভৃতি (*সম্বাদ রসরাজ*, ৩১.৮.১৮৪৯ খ্রি.)। রুচির মান এমনই ছিল যে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়ে দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না' (*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯০৩ খ্রি.)। পত্রিকাই যে নিন্দাস্রোতের একমাত্র বাহন ছিল তা নয়, বই

Scanned with CamScanner

ছাপিয়ে, পাল্টা বই ছাপিয়ে, কুৎসা করাটা প্রায় এক প্রাতিষ্ঠানিক আকার নিয়েছিল। ছাপিয়ে প্রচার করার মতো পয়সা ছিল না বলে গরিবদের গালমন্দে আগ্রহ ছিল না তা নয়, সাক্ষী রয়ে গেছে প্রচলিত ছড়া কিংবা কবিগান, গণ্যমান্য কারও অবমাননায় তাদের উল্লাস যাতে ফুটে বেরিয়েছে।

তৎকালীন বাজারচলতি নিন্দাকুৎসাভিত্তিক রচনার সঙ্গে হুতোমের নকশার সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বেশি হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ট মিল আছে। কুৎসা প্রচারের কারণ বংশানুক্রমিক বিরোধ, স্বার্থের লড়াই, দলাদলি বা নিছক ঈর্ষা যাই হোক না কেন, লক্ষ্য একটাই, উদ্দিষ্টকে হীন, নীচ প্রতিপন্ন করা, অপমান করা, হাস্যাস্পদ করা। সামাজিক দোষ সংশোধন প্রচেষ্টার মোড়কে হুতোম তাই করেছেন।

তিনি যে ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করছেন নক্‌শার প্রথম ভূমিকায় তা স্বীকার করেননি, ('সত্য বটে অনেকে নক্‌শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকী স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই')' কিন্তু দ্বিতীয় ভূমিকায় অসংকোচে বলেছেন, 'তবে বল্‌তে পারেন্ ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহদুর ও বর্দ্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসোরে এলেন?' এই সাদৃশ্যটুকু বাদ দিলে হুতোমের অনেকটাই মৌলিকত্ব রয়েছে, যা বুঝতে তৎকালীন সামাজিক অপরাধের দিকটি জানা দরকার, কারণ, নিন্দার ভিত্তিই ছিল তাই। হুতোম যাদের ব্যঙ্গ করেছেন তারা সবাই তাঁর স্বশ্রেণির, কেউই নিতান্ত সাধারণ, অপরিচিত মানুষ নন। সবাই তাদের চিনত বলেই নক্‌শা সাধারণের কাছে এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

হুতোম এদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন, সাহেবি ওল্ড, আর নিউ ক্লাস ও খাস হিন্দু। অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষিত, সাহেবি চালচলনের অন্ধ অনুকরণকারী ওল্ড ক্লাস, ইংরাজি শিক্ষিত অথচ সাহেবদের হুবহু নকল করেন না এমন নব্যরা আর ইংরাজি না জানা সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দু। হুতোম বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারেননি, যেটুকু জানা আছে, এদের মধ্যে অর্থসংগতির রকমফের ছিল, যারা ধনী, তাদের অর্থোপার্জনের উপায় জমিদারি, বেনিয়ানগিরি, ব্যবসা। ধনী না হয়েও যারা সমাজে পরিচিতি অর্জন করেছে, তাদের প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, অনেকেই ব্রাহ্ম, অধিকাংশের পেশা চাকরি।

ধন উপার্জনের পন্থায় বেশ বড় এক দলের কোনও ছুৎমার্গ নেই, যেন তেন অর্থোপার্জনই লক্ষ্য। একবার অর্থশালী হলে প্রয়োজনানুরূপ দানধ্যান করে, প্রভাবশালী সাহেবদের ধার দিয়ে বা ঘুষ দিয়ে 'কিনে' রেখে এমন দোর্দণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হত যে, এদের সঙ্গে কেউই পেরে উঠত না। তার সুযোগ নিয়ে এরা আইনি-বেআইনি নানা উপায়ে সম্পত্তি বাড়িয়ে চলত। সম্পত্তি অধিকার বা টাকা রোজগারের জন্য এদের অনুসৃত যে সব পন্থা আজকের দিনে অপরিচিত তার কয়েকটি বলা যেতে পারে, ক) সম্পদশালী কোনও

Scanned with CamScanner

পরিবারের অভিভাবক মারা গেলে ও উত্তরাধিকারী নাবালক থাকলে তার অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব হস্তগত করে সম্পত্তি বেনামে আত্মসাৎ করা, খ) কোনও ধনী পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিবাদে সালিশি হয়ে বিবদমান দুই পক্ষ থেকে ঘুষ নেওয়া, গ) ধনী পরিবারের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া (এই পন্থাটির বিশেষ একটি প্যাটার্ন ছিল, সম্পত্তির দখলদার ও বঞ্চিত দুই পক্ষে মামলা, স্বাভাবিক ভাবেই বঞ্চিত পক্ষের মামলা চালাবার অর্থসামর্থ্য নেই, মহাজন তার জিতবার সম্ভাবনা কতটা দেখে বা প্রভাব খাটিয়ে মামলার রায় অনুকূলে আনতে পারবে কি না দেখে টাকা ধার দিত, হয় অবিশ্বাস্য চড়া সুদে নচেৎ প্রাপ্তব্য সম্পত্তির ভাগিদার হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে। দেখা যেত শেষে দুই পক্ষই বঞ্চিতের দলে, লাভবান একমাত্র মহাজন), ঘ) 'ক্রীত' সাহেবদের দিয়ে বা নিজ বুদ্ধিবলে কারও বিপদ উদ্ধার করে মোটা টাকা ফি নেওয়া, ইত্যাদি।

সামাজিক নীতিবোধের কথা আগেই বলা হয়েছে, এগুলিকে কেউ অপরাধ বলে গণ্য করতেন না, ব্যবসায়ে অংশিদারকে প্রবঞ্চনা বা নির্মম প্রজাশোষণ এত সাধারণ অপরাধ যে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। একমাত্র যৌন অপরাধ ছিল প্রকাশ্য নিন্দার বিষয় যদিও তারও কোনো ঘাটতি ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা বলা যেতে পারে। অর্থোপার্জনের যেসব বিশিষ্ট পন্থার কথা উপরে বলা হয়েছে তার অন্তত কয়েকটিতে যে দ্বারকানাথের অরুচি ছিল না, তার প্রমাণ আছে। অর্থোপার্জনে কোনো ছুৎমার্গও তাঁর ছিল না, কলকাতার একটিমাত্র এলাকাতে একমাত্র তিনি ছিলেন তেতাল্লিশটি বেশ্যালয়ের মালিক বা বলা উচিত এমন বাড়ির মালিক যার ভাড়াটের একমাত্র পেশা বেশ্যাবৃত্তি (*Calcutta: Myths and History*, S. N. Mukherjee, Calcutta, 1977)। সে যুগের বহুল প্রচারিত কুৎসা পত্রিকা 'সম্বাদ রসরাজ'-এর নব্বইটির অধিক সংখ্যা দেখেছি, তার একটিতেও দ্বারকানাথের অর্থনৈতিক কোনও কেচ্ছা প্রকাশিত হয়নি, অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ আছে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্বারকানাথের শয়ন কক্ষের 'ঘনিষ্ঠ' সম্পর্ক ছিল এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ তারাচাঁদের ভাল চাকুরিলাভ ইত্যাদি (*সম্বাদ রসরাজ*, ২৬.৬.১৮৪৯ খ্রি.)।

সেই যুগের অন্যান্য বাজারচলতি রচনার থেকে হুতোমের নকশার পার্থক্য, হুতোম অর্থনৈতিক অপরাধকে রেয়াৎ করেননি, সত্যের খাতিরে বলা উচিত, মুখ্য বিষয়ও করেননি কখনও। দ্বিতীয়ত, নকশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেননি এবং একটি মাত্র উদাহরণ বাদে অন্যত্র মুখরোচক যৌন কেচ্ছাকে প্রাধান্যও দেননি। সহজে চোখে পড়ে না, এমন আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে।

সে সময়ে কুৎসার বিষয় ছিল দু'রকম, একটু রহস্য করে বলা যেতে পারে; 'বর্তমান' ও 'অতীত'। 'বর্তমান' হচ্ছে একেবারে সমসাময়িক কুকীর্তি, যেমন ১৮৪৯ খ্রি. ঘটনা, বীরনৃসিংহ মল্লিকের শ্বশুর লোকনাথ মল্লিক পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেছে, (*সম্বাদ রসরাজ*, ২২.৫, ২৯.৫ ও ৮.৬.১৮৪৯ খ্রি.) তা নিয়ে দিনের পর দিন মুদ্রিতাক্ষরে কুৎসার স্রোত বয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এই সব 'বর্তমান' কেচ্ছারাই 'অতীত' কেচ্ছায় রূপান্তরিত হত, কিন্তু তা

Scanned with CamScanner

ছাড়াও 'অতীত' গ্রুপের এক বৃহদংশ হচ্ছে জাতপাতের কেচ্ছা, যা কি না স্থায়ী কলঙ্ক। নাম করা বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেউ আদিতে ছিলেন পাচক বা মুদি, নিম্নবর্ণের কেউ পয়সার জোরে উচ্চবর্ণের পদবি ধারণ করেছে ('দুলোল হল সরকার আর ওক্কুর হল দত্ত, আমি কি না রইবো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত', সে যুগে প্রচলিত ছড়া), তার বংশধরদের দরকারমতো সে কথা মনে করিয়ে দিলেই হল। ঠাকুরবাবুরা সমাজের মাথা, কিন্তু পিরিলী, পতিত ব্রাহ্মণ, সদ্‌ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের আহার বিহার নিষিদ্ধ, মাঝে মাঝেই দেখা যায় এই কেচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। লক্ষণীয়, হুতোম একমাত্র 'স্নানযাত্রা' ছাড়া অন্য কোথাও 'বর্তমান' কেচ্ছাকে নকশার বিষয় করেননি, খোঁচা দেওয়ার জন্য তাঁর 'অতীত' কেচ্ছাই বেশি পছন্দ। হুতোমি মৌলিকত্ব হচ্ছে, চলতি ধরনমতো ঘটনা বা কোনো ব্যক্তির কুকর্মকে খণ্ডিতরূপে উপস্থিত না করে, তাকে যথার্থ পটভূমিকায় বিবৃত করে কারণ-অনুসন্ধানী মনের পরিচয় দেওয়া।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য আরও সূক্ষ্ম, যে সব চরিত্রের সরাসরি নিন্দা বা কুৎসা করার মতো কিছুই নেই, তাদের সঙ সাজিয়ে হাজির করা। যেমন, 'রেলওয়ে' নকশায় হুতোম প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের চেহারা বা সখ নিয়ে তাঁদের হাস্যাস্পদ করেছেন।

হুতোমের নকশা প্রকাশিত হওয়ার পর দুটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, অপাঠ্য কুৎসা সাহিত্যের প্রকাশ্য সমাজ থেকে নির্বাসন, দ্বিতীয়, জবাব এবং পালটা জবাবের জোয়ার। প্রথমটির কারণ সর্বাংশে হুতোমের নকশা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রভৃতি অন্যান্য কারণও আছে, তবুও হুতোমি দৃষ্টান্তে অশ্লীল গাল না দিয়েও যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করা যায়, এই বোধ নিন্দা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও লেখক উভয়েই হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়টির সাক্ষ্য শুধু প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নয়, এই চাপান-উতোরের স্মৃতি অনেককাল পরেও সমকালীনদের মনে ছিল, অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত' (*অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, ড. অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮২)। নকশাজাতীয় রচনা কালীপ্রসন্নের আগে পরে অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু একটি বইতে এত লোককে বিদ্রূপ করার দৃষ্টান্ত আর একটিও নেই, এত জনকে একসঙ্গে শত্রু বানাবার সাহস কারও ছিল না। মনে রাখতে হবে, কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ কুচিত্র' বই উৎসর্গ করেছেন 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়' হুতোমচাঁদকে। হুতোমের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা তৎপক্ষীয়রাই শুধু জবাব লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য, হুতোমের লক্ষ্যভেদে উৎসাহিত হয়ে প্রচুর নতুন লেখকের আবির্ভাব ঘটে। সমাজ সংস্কারের অজুহাতে বিদ্রূপবাণ বর্ষণই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। হুজুক এবং কেচ্ছাপ্রিয় বাঙালির পক্ষে অতীব স্বাদু এক সমন্বয়ের আবির্ভাব ঘটে, রম্য কেচ্ছার হুজুক, যার পথপ্রদর্শক হুতোমের নকশা।

Scanned with CamScanner

নকশার বিষয় নির্বাচন আর গঠন খুঁটিয়ে দেখলে নকশা লেখার অনুপ্রেরণা যে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, ধারণা থেকে এসেছে, এমনই মনে হয়। কালীপ্রসন্ন ব্যক্তিগত জীবনেও নাকি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন, তিনি 'যত বড় নামজাদা মহারাজা রাজা কি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ধনী-ই হোন, সবার-ই সম্মুখে তাঁদের ভন্ডামীর বা ন্যাকামীর ব্যাখ্যানা করতেন, প্রায় তখনকার সকল বড়মানুষ-ই সিংহ-দত্ত এক একটি ব্যঙ্গাত্মক ডাকনাম পেয়েছিলেন' (তদেব)। সমাজ সংস্কারের কোনও পরিকল্পিত চেষ্টার চিহ্ন নকশায় নেই। পরিহাসপ্রিয়তা তাঁর এতই প্রবল যে স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সকল বিদ্রূপযোগ্য চরিত্রকে এনে হাজির করা বা প্রাসঙ্গিকতার দূর সীমানায় থাকলেও যে কোনো 'জোক' ধরনের মজার গল্প ঢুকিয়ে দেওয়া। এই ঢিলেঢালা ভাব তিনি যে কিছুটা সংশোধনের চেষ্টাও করেছিলেন তা পাঠভেদ অনুসরণ করলে বোঝা যায়। কিন্তু নকশাকে তিনি কখনওই পুরোপুরি সমাজ-সংস্কারী উদ্দেশ্যমূলক করে তুলতে পারেননি যদিও ভূমিকায় বলেছেন, সামাজিক উন্নতিবিধানে নকশা সফলকাম হয়েছে।

'হুজুক' পর্বের 'ছেলে ধরা', 'লালা রাজাদের বাড়ী দাঙ্গা', 'মরাফেরা', 'সাত পেয়ে গরু' প্রভৃতি নিতান্তই সাময়িক হুজুকের বিবরণ, সমাজ প্রসঙ্গে স্বল্প যে কয়েকটি উক্তি এই নকশাগুলিতে স্থান পেয়েছে, তা গুরুত্বহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক। অপরদিকে 'আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা' চরিত্রে নিতান্তই ব্যক্তিগত। 'চড়ক' থেকে 'রেলওয়ে' পর্যন্ত নকশায় আর একটি পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রথম দিকে সামাজিক ছবিই গুরুত্ব পেয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে কম, শেষ দিকের নকশা যেমন 'হঠাৎ অবতার', 'স্নানযাত্রা', 'রেলওয়ে' প্রভৃতিতে ব্যক্তিচরিত্রের শ্লেষাত্মক বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এই পরিবর্তন হুতোমের সচেতন প্রচেষ্টার ফল, 'হঠাৎ অবতার' নকশার শেষে বলেছেন 'সহরের বড় মানুষেরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বাবু অ্যাক্ অ্যাক্ তরো, আমরা চড়কের নক্শায় সে গুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে', সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

নকশা লেখক কালীপ্রসন্নের জীবন মাত্র ত্রিশ বছরের, ১৮৪০ খ্রি. প্রারম্ভে জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা ধনী পরিবারে জন্ম, ১৮৪৬ খ্রি. পিতার মৃত্যু। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ, যাঁর সচ্চরিত্র ও শিক্ষানুরাগের সুনাম ছিল, কালীপ্রসন্নের অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান। ১৮৫৭ খ্রি. পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, তা ছাড়া গৃহশিক্ষকের কাছে পৃথক ভাবে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা করেন। ১৮৫৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। ১৮৫৪ খ্রি. বিবাহ, কয়েক বছর পরে স্ত্রীবিয়োগ, তার কিছুকাল পরে চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শরৎকুমারীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ। ১৮৫৫ খ্রি. 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকার সম্পাদক, ১৮৫৬ খ্রি. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে অভিনয়। ১৮৫৬ খ্রি. 'সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা' মাসিকপত্র প্রকাশ। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রিকা

Scanned with CamScanner

কিছুকালের জন্য সম্পাদনা। 'পরিদর্শক' নামে একটি দৈনিক পত্রিকার কিছুদিনের জন্য সম্পাদনা। বহু দান—শিক্ষাপ্রসারে, সাহিত্যচর্চায়, পত্রিকা প্রকাশে, দুর্ভিক্ষ নিবারণে, জনকল্যাণে, এ ছাড়া বিধবাবিবাহকারীকে নগদ পুরস্কার, লঙের জরিমানা প্রদান, লর্ড ক্যানিং-এর মূর্তি স্থাপনে দান ইত্যাদি। ১৮৬৩ খ্রি. অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ পিস পদলাভ। ১৮৫৮-৬৬ খ্রি. পণ্ডিতদের সাহায্যে মহাভারত অনুবাদ ও বিনামূল্যে বিতরণ। তাঁর অন্যান্য রচনা 'বাবু' নাটক (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৬), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮), 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৫৬), 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ কয়েক বছর ঋণগ্রস্ত হয়ে অধিকাংশ সম্পত্তি হারান, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ১৮৭০ খ্রি. মৃত্যু।

কালীপ্রসন্নের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি থেকে তিনি যে তাঁর শ্রেণির অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায় কিন্তু যথাসম্ভব সম্পূর্ণের আন্দাজ পেতে তাঁর চরিত্রের অন্য দিকগুলিও দেখা উচিত। নকশা প্রকাশিত হওয়ার পর তার 'জবাব' বের হয় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩ খ্রি.)। হুতোমের দলের লোক নিশাচর ওরফে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫ খ্রি.) বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরোবার পর 'চিড়িয়াখানায় নানা প্রকার স্বর শোনা যেতে লাগ্‌লো। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো করে ধোরে ফেল্লেম.....ওদিকে কা কা করতে করতে একটা কাফরি দাঁড়কাকের বাচ্ছা উড়ে এলো। তারেও ধরা গেল।' হুতোমের নকশার এই অপরিচিত জবাবটি কি ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫ খ্রি.)? এর শুধুমাত্র প্রথম ভাগ লভ্য, কাহিনী অসমাপ্ত, মফস্বলের লম্পট, মাতাল জমিদার জয়হরিবাবুর কুটনী দিয়ে গৃহস্থবধূ ফুসলোবার চক্রান্ত অবধি বিবৃত হয়েছে।

হুতোমের স্বল্পপরিচিত অপর জবাব টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র প্রণীত 'কলিকাতার নুকোচুরি', ১৮৬৫ খ্রি. লেখা হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রি. লেখকের প্রকৃত নাম চুনিলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। কোন্নগরের খ্যাতনামা ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র দেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। চুনিলালের ক্রোধের সংগত কারণ আছে, 'রেলওয়ে' নকশায় হুতোম তাঁর বাবা ও শ্বশুর দুজনকেই ব্যঙ্গ করেন। আরও লক্ষণীয়, বইটি চুনিলাল উৎসর্গ করেছেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে, উল্লেখ করা হয়েছে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' ইত্যাদি লেখক। চুনিলালের 'মানস ছিল না যে ছাপা হইবে', শুধু ভোলানাথের 'বিশেষ উদ্‌যোগে'-র ফলে তা প্রকাশিত হয়। ভোলানাথ, বোঝা যায় হুতোমের নির্মম প্রত্যাখ্যানের রাগ ভুলতে পারেননি (টীকা ১৫, ১৭, ১৮ দ্র.)। চুনিলাল খোলাখুলিই বলেছেন, হুতোম নিজে দুষ্কৃতিকারী হয়ে তাঁর নকশায় অপরাপর সকলের দুষ্কর্মের নিন্দা করেছেন, 'কাকের মাংস কেহ খায় না, কিন্তু কাক সকলেরই মাংস ভক্ষণ করে'। হুতোমের নকশা লিখিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র কেতাব হয়। তিনি সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত, হেন সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম্ম নাই যে তিনি করেননি। মন্দের ভাগই অধিকাংশ, সতের মধ্যে ভারতে মহাভারত ভিন্ন আর কেহ কিছু বলতো না।'

Scanned with CamScanner

নিন্দার সব সত্য হয় না বলাই বাহুল্য, কিন্তু কালীপ্রসন্নের আদলে অঙ্কিত চরিত্রগুলির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য সব 'জবাব'-এই এক, তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই বইগুলি থেকে হুতোমের যে চরিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সারমর্ম, ধনীর সন্তান, বাল্যে পিতৃহীন। পিতার গর্হিত আমোদে রুচি ছিল। যতদিন একজিকিউটরের হাতে সম্পত্তি ছিল, মায়ের কাছে আবদার করে টাকা নিয়ে গাঁজা, চরস, মদ খাওয়া, নাটকের দল করা, মদ্যপ মোসাহেবদের নিয়ে সভা প্রতিষ্ঠা করা, কাগজ বার করা চলেছে। বিষয় হাতে পেতে কুকর্ম আরও বাড়ল। সভাসদদের নিয়ে ব্রাহ্মণের টিকি কাটা, গৃহস্থের মেয়ে ফুস্‌লানো, গণিকালয় গমন শুরু হল। ক্রমে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করাতে ঋণগ্রস্ত, সম্পত্তিনাশ, তারপর পাওনাদারের ওয়ারেন্টের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন সংক্রান্ত সকল নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রমাণ বিচার করলে তা বলা যায় না। আত্মকথন অনুযায়ী তাঁর যশ-আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তেরো বছর বয়েসে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, অধিকাংশ সভ্যেরই বয়েস প্রতিষ্ঠাতার থেকে অনেক বেশি, বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সৎকার্যে ধনী পৃষ্ঠপোষকতার আমন্ত্রণেই তাঁদের আগমন, নইলে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিজ গুণে আকৃষ্ট হওয়ার মতো কোনও কারণ তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। বাদবাকি সভ্যরা বিনা পয়সায় পানভোজনের লোভেই মনে হয় আসতেন, সভার কাজে তাঁদের অন্য কী অবদান ছিল, জানা যায় না। নক্‌শা পূর্ববর্তী রচনাগুলি যে ভাড়া করা লেখকের এমন ইঙ্গিত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় করেছেন। কালীপ্রসন্ন যে সাহিত্যগুণবর্জিত ছিলেন তা নয়, নকশা রচনা ও মহাভারত অনুবাদ সম্পাদনা তার প্রমাণ। রাজামহারাজা খেতাবধারীদের ঠাট্টা করলেও খেতাব প্রাপ্তির আগ্রহ হয়তো তাঁর নিজেরও ছিল, বিধবাবিবাহকারীদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা নিজে গিয়ে সম্বাদ ভাস্কর কার্যালয়ে ঘোষণা করে আসেন, সে বিষয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' (২২.১১.১৮৫৬ খ্রি.) লেখে 'ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে হিন্দু প্রবরদিগের মধ্যে যথার্থ নরসিংহরূপে সম্বোধন করিতে হয় কিনা রাজপুরুষগণ দর্শন করুন, বিশেষত শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং ও শ্রীমতী লেডী কেনিং এবং শ্রীযুক্ত লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর ও ব্যবস্থাপক—সমাজবর শ্রীযুক্ত গ্রান্ট বাহাদুর শ্রীযুত কালভিল বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন...পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় "মহারাজ বাহাদুর" নামের যোগ্য পাত্র হউন।' সাধারণত সে যুগে সম্পাদকেরা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে বাদ দিলে, এ ধরনের লেখা বিনা ইঙ্গিতে ও প্রাপ্তিতে লিখতেন না। কালীপ্রসন্ন অবশ্য পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রাখেননি। নামপ্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই বোধহয় তাঁর আগ্রহের সমাপ্তি ঘটত।

এই মানসিক অস্থিরতার নিদর্শন তাঁর পত্রিকা সম্পাদনার বৃত্তান্ত। তাঁর সম্পাদনায় কোনও পত্রিকারই বছরখানেকের বেশি আয়ু নয়, 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'পরিদর্শক'-এর তিন চার মাসের বেশি নয়। স্ববৈপরীত্যের উদাহরণ তাঁর চরিত্রে প্রচুর, ওয়েলস বিরোধী সভায় বক্তৃতা করছেন (টীকা ৪৪৪) আবার তারই বিদায়কালে অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষরও করছেন, যাকে ব্যঙ্গ করে দীনবন্ধু মিত্র 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' রচনা করেন।

Scanned with CamScanner

হরেক রকমের নেশাড়ে আর তাদের কুৎসিত আমোদের প্রখর নিন্দা করে নিজের বাগানবাড়িতে তার পুনরাবৃত্তি করছেন। '...বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের চীৎপুরের বাগানে এক ব্যক্তি মদ্যে নেশা হয় না বলিয়া তাহাতে মরফিয়া (অহিফেনসার) মিশ্রিত করিয়া খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত এইরূপ একটি ভয়ঙ্কর জনরবও উঠিয়াছিল যে কালীপ্রসন্ন বাবু রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত মদে মরফিয়া মিশাইয়া দিয়াছিলেন।....পরিতাপের কারণ এই, কালীপ্রসন্ন বাবু হইতে বঙ্গদেশের অনেকবিধ উপকার লাভ হইতেছে, তাঁহার আলয়ে এরূপ একটী অনর্থকর কুৎসিত ঘটনা হইল! শান্তি রক্ষকেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করাতে তাঁহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে তিনি নির্দ্দোষী হইয়াছেন' (*সোমপ্রকাশ*, ২.২.১৮৬৩ খ্রি.)। খুব সম্ভব এই ঘটনাকে মনে রেখেই 'কলিকাতার নুকোচুরি'-তে লেখা হয়, 'যখন যা মনে আসে তাই করেন।.....বাঁদি নেসা না হলে কখন বা মদের সঙ্গে, লডেনম্, ও মরফিয়া মিশাচ্ছেন।.....কোথাও ভটচাজ্জির টিকি কেটে সন্দেশের সঙ্গে ফ্যান্সি বিষকুট দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। কোথায় কাহাকে ডাবের জলে এমিটিক দিয়ে খাওয়াচ্ছেন।' টিকি কাটার কথা হুতোম নিজেও বলেছেন। ইমেটিক (Emetic) খাওয়ানোর গল্পের জন্য দ্রষ্টব্য 'ভূত নাবানো' নকশা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তা হলে কি কালীপ্রসন্ন একজন পুরোপুরি ভণ্ড? তাঁর দু-একটি কাজের উদাহরণ দেখলে তা আদপেই মনে হয় না। ১৮৬৫ খ্রি. তিনি যখন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, জনৈক ডাঃ বীটসনের কেরানি মহেশচন্দ্র দাসের নামে ডাক্তারের পকেটবই চুরির অভিযোগ আসে, কালীপ্রসন্ন বিচার করে মহেশকে কারাদণ্ড দেন। কিছুকাল পর জানতে পারেন চোরাই মাল অন্য লোকের কাছে আছে ও মহেশ নির্দোষ। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে গভর্নমেন্টকে চিঠি দেন ও লেঃ গভর্নর তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। 'সোমপ্রকাশ' (১৬.১.১৮৬৫ খ্রি.) এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখে 'তাঁহার উপস্থিত বিষয়ের প্রশংসা আর সমুদায় অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।' দ্বিতীয় উদাহরণ নকশায় তাঁর অকপট আত্মসমালোচনা, যা নিন্দকদেরও বিস্মিত করেছে, 'তাহার মহত্বতা গুণের পরিসীমা ছিল না, ভগবান ব্যাসদেব যেমন আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লজ্জিত হন নাই, সেইরূপ হুতুম আপনার নক্সাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যে গুলো অত্যন্ত ঘৃণাস্কর তাহাই বলেন নাই' (*কলিকাতার নুকোচুরি*)।

আত্মসমালোচনা কালীপ্রসন্নের চরিত্রের অন্তর্নিহিত সততাকে স্পষ্ট নির্দেশ করে। তাঁর চরিত্রে দুটি স্রোত, একদিকে সৎকর্মের দ্বারা লোকচক্ষে সম্মানিত হওয়ার আগ্রহ, অপরদিকে চাটুকার-মোসাহেব নির্দেশিত, সে যুগের ধনীদের প্রিয়, আমুদে জীবনের প্রলোভনও এড়াতে পারছেন না। কিন্তু তাঁর চরিত্রের কেন্দ্রে সততা ছিল, যে পরিমাণ আত্মজ্ঞতা মানুষকে সকল আত্মধ্বংসী দুর্বলতা থেকে বাঁচিয়ে যৌক্তিক পথে পরিচালিত করে, যা তাঁর লাভ করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও ছিল, তা পাওয়ার আগেই চরম দুর্দৈব ডেকে আনল আর্থিক বিপর্যয়। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, তা তাঁর স্বকৃত। পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা মনে হয় ১৮৬৫ খ্রি. থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থার পতনের আরম্ভ। তিনি যাদের কাছে ঋণ করেছিলেন, বা ধারে কিনেছিলেন এমন সব পাওনাদারেরা ঋণ পরিশোধের আর আশা

Scanned with CamScanner

নেই দেখে মামলা করতে শুরু করে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দেই তাঁর নামে এই ধরনের অন্তত কুড়িটি মামলা রুজু হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আদালতে হাজির না হওয়াতে বা স্বপক্ষ সমর্থন না করাতে একতরফা ডিক্রি হয়ে যায়। তাঁর একের পর এক সম্পত্তি আটক ও বিক্রি করে পাওনাদারদের দাবি মেটাতে লাগলেন হাইকোর্টের শেরিফ। তাতেও কুলোল না, সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসল। পাওনাদারদের দাবিতে ওয়ারেন্ট জারি হল কালীপ্রসন্নের নামে, তিনি ওয়ারেন্ট এড়াতে বরানগরে তাঁর বাগানবাড়ি ('সারস্বতাশ্রম'), যেখানে মহাভারত অনুবাদের কাজ হত সেখানে থাকতে লাগলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, শেরিফ তাঁকে ১৮৭০ খ্রি. ২২শে মার্চ আদালতে হাজির করলেন, বিচারপতি অবশ্য কারাগারে না পাঠিয়ে মুক্তি দিলেন। চারমাস বাদে ২৪শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন-চরিত্র সম্যক বুঝতে তাঁর জীবনের এই পর্বের সঙ্গে আরও কতকগুলি তথ্য মনে রাখা দরকার। ১৮৬৬ খ্রি. তাঁর অনুবাদিত মহাভারতের শেষ খণ্ড প্রকাশিত ও অন্যান্য খণ্ডের মতো বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ১৮৬৮ খ্রি. নক্‌শার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা' নামে নতুন ভূমিকা সহ। অনস্বীকার্য, কর্মে বা লেখায় কালীপ্রসন্নের তৎকালীন দুর্দশার স্পষ্ট কোনও চিহ্ন নেই ('বারোইয়ারি', পাঠভেদ 15 দ্র.), নিয়তিকে তিনি যেন অবধারিত জেনেই এগোচ্ছিলেন। কৃপণতাকে কালীপ্রসন্ন অনভিজাত বৈশিষ্ট্য মনে করতেন ঠিকই, কিন্তু যিনি নক্‌শায় কেমন করে অনভিজ্ঞ ধনীসন্তান মোসাহেব, নায়েব আর উকিলদের দ্বারা প্রতারিত হয়, তার বর্ণনা করেছেন, তাঁর স্বয়ং প্রবঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ট্র্যাজিক, কিছুটা অবিশ্বাস্যও বটে।

সামাজিক ছবি আর ব্যক্তিবিশেষকে বিদ্রূপ, দুই নিয়ে হুতোমের নক্‌শা। কালীপ্রসন্নের যে মানসিকতার পরিচয় হুতোমের নক্‌শা থেকে পাওয়া যায় তা বিচিত্র, সমকালীন অধিকাংশের থেকে তিনি অগ্রসর চিন্তার অধিকারী আবার পিছুটানও এড়াতে পারেননি। সমাজ সংস্কারের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি আগ্রহী, যে সময় অধিকাংশের ধারণা সামাজিক উন্নতির চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে ধর্মে, ধর্মসংস্কারেই আসবে আদর্শ সমাজ, হুতোম সনাতন কি নব্য ধর্মের ভণ্ডামি দেখে হাসছেন, ঈশ্বরকে 'কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগাঁয়ে জমিদার' আখ্যা দিচ্ছেন। আবার তাঁর নিজের প্রবল বংশগর্ব, বর্ণগৌরব। নিম্নবর্ণের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য সীমাহীন, নিম্নবর্ণের মানুষ টাকার জোরে উচ্চবর্ণের সমান হতে চাইলে তাঁর চাবুক খায়। বংশকৌলীন্যহীন ধনী তাঁর বিদ্রূপের পাত্র।

কিন্তু এ জন্য কালীপ্রসন্নকে সনাতন হিন্দু ধর্মের, বর্ণাশ্রমের গোঁড়া সমর্থক ভাবা ভুল হবে। বংশমর্যাদা,আভিজাত্যকে তিনি শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে এক করে দেখতেন, সমাজের চূড়ায় বসার ন্যায্য অধিকার কেবলমাত্র এই মুষ্টিমেয়র, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। বড় বড় নামকরা বংশকে উৎসন্নে যেতে দেখে তাই তাঁর দুঃখ, ইংরাজদের কৃপায় যে সব বংশের উত্থান, টাকার জোরে তাদের অভিজাত বনতে দেখে, অসংস্কৃত আচরণ করতে দেখে তাঁর ব্যঙ্গ ঝলসে ওঠে। বাঙলায় ইংরেজাগমনের পূর্ব থেকে যে সব বংশ খ্যাত, তাদের বংশধররাও কেউ কেউ কম নিন্দনীয় আচরণ করেননি, কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন,

Scanned with CamScanner

কালীপ্রসন্ন তাদের কাউকেই নকশার উপজীব্য করেননি। তবে ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই 'নক্‌শা' নব্য অভিজাতদের স্থানচ্যুত করার আক্রমণ নয়, স্থানাভিষিক্ত হওয়ায় আক্ষেপ, নিজেকে সঙ সাজানোর হয়তো আরেক গৌণ কারণ।

কালীপ্রসন্নের অপর ক্ষোভ ধনকৌলীন্যহীন, ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির ওপর। তারা সমাজ পরিবর্তনে সফল হবে, অনেকের মতো তিনিও এ আশা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে নিরাশ। সামাজিক অন্যায়, গলদ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অর্থ, সম্মান, ক্ষমতা বৃদ্ধির সাধনায় যারা রত সেই অমানুষদের দলে তিনি নন, অথচ সমাজ পরিবর্তন কর্মসূচির পরিষ্কার রূপরেখা তাঁর অজানা, নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্বও তিনি নন,— একটাই পথ খোলা, সমালোচনা। তথ্যতত্ত্বের ধার না ঘেঁষে, ছদ্মনামী চরিত্রদের নিয়ে বাজারচলতি লেখার ধরন নিলেন কেন? নিজেই বলেছেন 'নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে— ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো— পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।'

হুতোম প্যাঁচা কে—

হুতোম প্যাঁচার লেখক কে বা কাহারা এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রথম সূচনা করেন সুকুমার সেন *(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৯ সন) পরে জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করেন। ('হুতোম প্যাঁচা কে এবং কেন', জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *দেশ,* ২৯.৩.১৯৬৯ খ্রি.)। এঁদের মিলিত বক্তব্য নক্‌শার রচয়িতা কালীপ্রসন্নের লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পারিষদ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁরা যে সব যুক্তি হাজির করেছেন সেগুলি অন্যান্যদের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে, বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ', ড. পরেশচন্দ্র দাস, কলিকাতা, ১৯৮৫ ও 'হুতোম প্যাঁচা— একটি বিতর্ক', সত্যব্রত দে, *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির যে বক্তব্য খুব সম্ভব এই সংশয় সৃষ্টির মূলে, তার সার, যখন নক্‌শার দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে, তখন ভুবনচন্দ্র ছিলেন তার লিপিকর এবং সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র নক্‌শার কিছু কিছু অংশ নিজে লিখতেন, যা কালীপ্রসন্ন সাদরে গ্রহণ করতেন। যেমন, 'বিদায় হও মা ভগবতী' গানটি কালীপ্রসন্নের ফরমাশে তাঁরই রচনা (টীকা ৬২৯ দ্র.)। লক্ষণীয় মহেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র দ্বিতীয় ভাগের কথাই বলেছেন। নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক ছিলেন কি না তার প্রমাণ আজও অপ্রকাশিত, জানা যায় বেহালার বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নবীনকৃষ্ণের পুত্রকে একটি চিঠিতে এই তথ্য বিবৃত করেন। পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, তিনি বলেছেন, 'নবীনকৃষ্ণ বাবু ঐ সময়ের একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল।... তাঁহার সহিত সিংহ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা এতই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার আকর্ষণে নবীন বাবু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং যতদিন সিংহমহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। নবীন বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে "হুতুম পেঁচার"

Scanned with CamScanner

সমস্তই সিংহমহাশয়ের নিজের লেখা, দুই চারি স্থানে সামান্য অংশ নবীন বাবুর লেখনীপ্রসূত। কালীপ্রসন্ন বাবু স্বাস্থ্য হারাইয়া যখন গঙ্গাতীরে (বোধ হয় বরানগরের নিকটে) অবস্থান করিতেন, তখনও নবীনকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্গী। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া নবীন বাবু সিংহমহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন' (' ঁকালীপ্রসন্ন সিংহ', চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক)।

আর একটি কথা বলা দরকার। যাঁরা কালীপ্রসন্নকে হুতোম বলে মনে করেন, তাঁরা সকলেই নক্‌শায় উত্তমপুরুষে বর্ণিত স্বকথনগুলিকে তাঁর আত্মজৈবনিক ধরে নিয়েছেন। তার কারণ নক্‌শার প্রথম ভূমিকাতেই হুতোম বলেছেন, স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই। দ্বিতীয় ভূমিকায় বলেছেন, স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। 'হঠাৎ অবতার' নকশার শেষে মন্তব্য করেছেন পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি।

এই স্বকথনগুলি সবই আছে 'হুজুক' পর্বে, 'হুজুক' শুরু হচ্ছে 'ছেলে ধরা' থেকে, হুতোম বলেছেন, আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনলেম। পরের নকশা 'প্রতাপচাঁদ', প্রতাপচাঁদ বর্ধমানে ফিরে আসেন ১৮৩৫ খ্রি., আদালতে নালিশ করেন ১৮৩৭ খ্রি., বরানগরে বাস ১৮৫৫-৫৬ খ্রি.। ভূকৈলাসে 'মহাপুরুষ'-এর আগমন ১৮৩২ খ্রি.। 'কৃশ্চানি হুজুক'-এর দলিপ সিং-এর খ্রিস্টান হওয়া ১৮৫৩ খ্রি., জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ১৮৫১ খ্রি.। 'মিউটিনি' ও 'মরাফেরা'-র ঘটনাকাল ১৮৫৭ খ্রি.। 'লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা-র মুচিখোলায় আগমন ১৮৫৭ খ্রি.। 'শিবকৃষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর মামলা ১৮৫৯ খ্রি.। 'জসটিস্ ওয়েল্‌স'-এর বিরুদ্ধে জনসভা ১৮৬১ খ্রি., নীলবিদ্রোহ ও লং-এর বিচার ১৮৫৯-৬১ খ্রি.। 'রসরাজ' সম্পাদকের শাস্তি ১৮৬২ খ্রি.। অর্থাৎ সবথেকে পুরনো ঘটনা মহাপুরুষের আগমন (১৮৩২ খ্রি.)। তারপর থেকে ১৮৬২ খ্রি. পর্যন্ত সাড়া জাগানো কয়েকটি ঘটনার কথা হুতোম বলেছেন। কালীপ্রসন্নের জন্মসাল ১৮৪০ খ্রি., অথচ ১৮৩২ খ্রি. মহাপুরুষের আগমনের সময় আত্মকথন অনুযায়ী তিনি স্কুলে পড়েন। সেইরকম, প্রতাপচাঁদ নালিশ করেন ১৮৩৭ খ্রি., হুতোমের তখন হাতে খড়ি হয়ে গেছে ও গুরুমহাশয়ের কাছে পড়েন। নিজেকে অধিকতর বয়স্ক প্রমাণের এই চেষ্টা কি নেহাতই আত্মগোপনের ছল অথবা অসতর্কতা অথবা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু, জানা নেই। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন যে নক্‌শার লেখক নন, তা বিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ নেই, নকশা জাতীয় বৈঠকি রচনায় অন্তরঙ্গ দু'-একজনের সামান্য সংযোজন থাকতেই পারে, সেজন্য মূল লেখকের কৃতিত্ব নস্যাৎ করা যায় না।

টীকাকারের সমস্যা—

নক্‌শার টীকাকারের কর্তব্য শব্দার্থ নির্ণয়, স্বনামে বা বেনামে হাজির সকল ব্যক্তি-পরিচয়, বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক নির্ণয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান। অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়াই রেওয়াজ এবং উচিত, কিন্তু প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত, তা ঠিক করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তা হচ্ছে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ

Scanned with CamScanner

সম্বন্ধে ওকিবহাল এবং নয়, এমন দু'জনের দ্বারা পৃথকভাবে অজ্ঞাত-অর্থ শব্দের তালিকা তৈরি করে তা অনুসরণ করা। যে সব শব্দের মূল বাংলা নয়, যথাসম্ভব তার মূল নির্দেশ করা হয়েছে। শব্দার্থ অজ্ঞাত থাকলে তাও বলা আছে, অর্থাৎ যে সব শব্দের অর্থ দেওয়া নেই, তারা অজ্ঞাত নয়, তাদের অর্থ নির্দেশ অপ্রয়োজনীয়, যদিও প্রয়োজনীয়তার ন্যায্যত্ব নিয়ে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা কিছুতেই দূর হওয়ার নয়।

সবথেকে বড় সমস্যা ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে, হুতোম উল্লিখিতরা দু'ভাগে বিভক্ত, স্বনামে ও বেনামে উপস্থিত। যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিতদের ক্ষেত্রে বিস্তৃতকারে। বেনামে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং শনাক্তরণ সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলায় বাধা আছে। হুতোম এঁদের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন খুব সম্ভবত আইন বাঁচাতে, কারণ, খাঁটি সত্য বলে জানলেও, কারুর কুকীর্তি বা অসৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাক্ষ্যনজির সহকারে আদালতে প্রমাণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এই কারণ এখনও বলবৎ আছে। তা ছাড়া যাঁদের শনাক্ত করা গেছে যেমন বাগাম্বর মিত্র = দিগম্বর মিত্র প্রমুখ, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে হুতোম বর্ণিত বজ্জাতির প্রমাণ নেই কেন, সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

মুশকিল হচ্ছে এঁদের মতো অনেককেই জীবনীগ্রন্থে মহাপুরুষ বানানো হয়েছে, তাঁদের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলি আলোচনা ও পুনরালোচনার ফলে লোকের মনে বিশ্বাস হয়ে গ্রথিত, অন্ধকারদিকের প্রমাণ বা প্রমাণসূত্র অধিকাংশই লুপ্ত, যা স্বল্প কিছু পাওয়া যায় ছড়িয়ে আছে আদালতের নথি, সম্পত্তির খতিয়ান, মহাফেজখানার দলিল আর মুষ্টিমেয়র স্মৃতিচারণায়। সেগুলি একত্র করে এতকালের প্রচলিত বিশ্বাস ভাঙার মতো সওয়াল তৈরি করতে গেলে টীকার স্বল্প পরিসরে কুলোয় না, পৃথক বই লিখতে হয়। হুতোমে এই ধরনের চরিত্র কম হলেও একটু দু'টি নয়, সমস্যাটির গভীরত্বের সঙ্গে তার পরিধির বিশালত্ব বিবেচ্য।

তা হলে যে প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী, তা হচ্ছে শনাক্তরণের ভিত্তি কী? হুতোম তাঁর ছদ্মনামী চরিত্রদের পুরোপুরি আড়ালে রাখতে চাননি, চিনতে পারার জন্য তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরও কিছু সূত্র সরবরাহ করেছেন, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদবি অবিকৃত, উদাহরণ, বাগাম্বর মিত্র, ছুঁচো শীল, পেঁচো মল্লিক ইত্যাদি। নামের মধ্যপদ যেমন কৃষ্ণ, চন্দ্র ইত্যাদি ও চরিত্রদের বাসস্থান যেমন জোড়সাঁকো, সিমলা, ঠনঠনে ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত। কয়েকটি ক্ষেত্রে উদ্দিষ্টদের জাত উল্লেখিত আছে, যথা ছিরে বেনে, পুঁটে তেলী ইত্যাদি। এ ছাড়া কয়েকটি চরিত্র যেমন, রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতির দৈহিক রূপ বর্ণনা করেছেন যা বাস্তবের সঙ্গে মেলে। অপর লক্ষণীয় বিষয় হুতোমের উদ্দিষ্টরা প্রায় সকলেই তাঁর সমসাময়িক, মৃতের উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না।

যে সব চরিত্রকে শনাক্ত করা যায়নি তাদের দৃষ্টান্তদানে শনাক্তকরণ সমস্যা আরও স্পষ্ট হবে। হুতোমের স্বকথন অনুযায়ী অন্তত সাতজন বাস্তব চরিত্র, তাদের কাল্পনিক মনে করার কোনও সুযোগ নেই, বাগাম্বর মিত্র, প্যালানাথ বাবু, পদ্মলোচন দত্ত, ছুঁচো শীল, পেঁচো

Scanned with CamScanner

মল্লিক, রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও বর্ধমানের হুজুর আলী। এদের মধ্যে প্যালানাথ ও অঞ্জনারঞ্জনের পরিচয় টীকায় নেই, প্রথমজনকে শনাক্ত করা যায়নি ও দ্বিতীয়জনের শনাক্তকরণ বিতর্কমূলক।

প্যালানাথের পরিচয়-সূত্রগুলি হচ্ছে, চকবাজারে বাস, শেরবার্ন সাহেবের ছাত্র, মুসলমানি কেতা পছন্দ আবার একাদশীও করেন, বাইমহলে জনপ্রিয়, জলে ডুবে মৃত্যু। অভিজ্ঞ পাঠক জানেন শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব অথবা হাটখোলার দত্ত পরিবারের কালীপ্রসাদ দত্তের সঙ্গে মুসলমান কেতা পছন্দ আর বাইমহলে জনপ্রিয়তার মিল পাওয়া যায়। যদি চকবাজার শোভাবাজারকে বুঝিয়ে থাকে তবে রাজকৃষ্ণ হওয়াই সম্ভব কিন্তু তৎকালে রাজকৃষ্ণের যে সামাজিক মর্যাদা তাতে বারোইয়ারির হাফ আখড়াইয়ের আসরে বিনা আড়ম্বরে আসা ও মাতব্বরি করা অস্বাভাবিক। আবার কালীপ্রসাদের বাসস্থান মিলছে না। উভয়ের নামের সঙ্গে প্যালানাথের কোনও মিল নেই, দু'জনে হুতোমের সমসাময়িক নন এবং শেরবার্ন সাহেবের ছাত্র হওয়াও কালাতিক্রম জনিত কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অঞ্জনারঞ্জনের সূত্র আরও সংক্ষিপ্ত, তিনি রাজা খেতাবপ্রাপ্ত, পদবি দেব, গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা, খিড়কিদার পাগড়ি পরেন, বদমাইসের বাদশা ও ন্যাকার সর্দার, বাইজিদের দল পুজোর সময় তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ পেতে উৎসুক। 'রাজা' খেতাব ও 'দেব' পদবি শোভাবাজারের রাজপরিবারের একান্ত নিজস্ব, দুর্গাপূজায় তাঁদের বাড়ির বাইনাচের প্রসিদ্ধি ছিল। চেহারার বর্ণনা ছবি দেখে কতকটা মেলানো যায় কিন্তু বদমাইসির বাদশা বিশেষত ন্যাকার সর্দার হওয়ার লিখিত প্রমাণ পাওয়ার আশা দুরাশা। 'বাদ দেওয়ার নীতি' (Process of elimination) ও পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে কোনও নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো গেলেও তা অনুমানই থাকে, যে জন্য বলা সম্ভব হয়নি যে অঞ্জনারঞ্জন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

'স্নানযাত্রা' নকশার নায়ক গুরুদাস গুঁই যে বাস্তব চরিত্র তার প্রমাণ কলিকাতার নুকোচুরি; নুকোচুরির লেখক বলেছেন, 'হুতুমের গুরুদাস গুঁই, মাথা ছেড়ে বেড়ে উট্‌লো। পীরের দরগায় দিব্বি কীর্ত্তি স্থাপন কোরেচেন' 'গুরুদাস গুঁই আজকাল ওয়েলর ঘোড়া চড়িয়া শ্‌হর কাঁপাচ্ছে'। গুরুদাস গুঁইয়ের পরিচয়-সূত্র, পেশায় ছুতোর, পদবি গুঁই— যা ছুতোরদের পদবি হয় না, বাস চাঁপাতলা (বর্তমান প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট অঞ্চল), গুরুজন স্থানীয়া কোনও আত্মীয়াকে নিয়ে বন্ধু সহযোগে ফূর্তি করতে গিয়েছিল ইত্যাদি। হুতোমের সমসাময়িক চাঁপাতলাবাসী এক ব্যক্তির পরিচয় জানা আছে, যিনি জাতে সূত্রধর ও যাঁর কাঠের কাজের বড় কারখানা ছিল। সন্দেহ আরও গাঢ় হয় যখন দেখি গুরুদাসকে চিনতে পেরে মেকিন্টস বরন্ কোম্পানির ছুতোররা তাদের নৌকো থেকে, 'চুপে থাক্ থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্‌নে...' গান গেয়ে দুয়ো দিয়ে গেল। এই ব্যক্তির কলকাতায় কারখানা, অর্থ সবই তাঁর মামার দয়ায়, মামাই ভাগ্নেকে কলকাতায় নিয়ে এসে সূত্রধর-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর আর্থিক সমৃদ্ধিলাভের কালও 'কলকাতার নুকোচুরি'-র বর্ণনাকালের সঙ্গে মেলে। কিন্তু পদবি গুঁই নয়, সবথেকে বড় কথা, তাঁর অগম্যা সমভিব্যহারে ফূর্তি করতে যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যে জন্য বলা সম্ভব হয়নি ইনি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র।

Scanned with CamScanner

কয়েক ক্ষেত্রে হুতোম প্রদত্ত সূত্রের স্বল্পতার জন্য অনুমানের ভিত আরও নড়বড়ে। যেমন, 'ভূত নাবানো' নকশায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো ডাক্তারের উল্লেখ আছে, যিনি রাতের বেলা ডাক পেয়ে মদের নেশায় চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সুদ্ধ মশারি গায়ে দর্শন দেন। সে যুগের চিকিৎসকদের মধ্যে যিনি চিকিৎসক ও সুরাসক্ত হিসাবে সবথেকে সুখ্যাতি-অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি ডঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি (১৮১৯-৭০ খ্রি.), কিন্তু ওই বিশেষ ঘটনার প্রমাণাভাবে অনুমান অনুমানের স্তরেই থেকে যায়। 'নাক্‌কাটা বঙ্ক' নক্‌শার বঙ্কবেহারিকে নিঃসন্দেহে সেকালের পাঠক চিনতে পেরেছিলেন, তাঁর নাকটি কাটা, সিমলা অঞ্চলে বাস, পেশা উকিলের কেরানিগিরি, দাদা সেলরদের দালাল আর ছোট ভাই পাইকেরের দোকানদার— কিন্তু পদবি না-জানা কোনও ব্যক্তির এই পরিচয় সূত্রগুলি অবলম্বন করে আজ আর নিঃসংশয়ে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। 'রামলীলা' নকশার ভবানীবাবু ও হলধরবাবু সম্বন্ধে একই বক্তব্য।

নকশার অধিকাংশ ছদ্মবেশী চরিত্র আসলে এমন এক ধাঁধা, যার সঠিক উত্তরপত্র চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, উত্তরদাতা এবং পরীক্ষক, দুজনকেই নির্ভর করতে হবে হুতোম কথিত সূত্র আর অনুমানের উপর। সেজন্যই, আশা করা অনুচিত হবে না, ক্ষেত্রবিশেষে টীকাকারের অক্ষমতা সুধী পাঠকের মার্জনা লাভ করবে।

টীকার ধরন সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলার আছে। নকশায় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত, যেমন, কালিদাস, কৃত্তিবাস, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। যারা স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত, তাদের পরিচিত পূর্বে উল্লেখিতদের থেকে যথাসম্ভব বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুপরিচিত ও অপরিচিত ঘটনা প্রসঙ্গেও একই নীতি অনুসৃত। তবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, ঘটনার পরিচয় দানে যেন হুতোমের বর্ণনার সমর্থন বা অসমর্থন যাই হোক না কেন, তা পাওয়া যায়। তা ছাড়া সুপরিচিত ঘটনার একটি বিশেষ অংশ তত পরিচিত না থাকলে, কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিকতার ঝুঁকি নিয়েও সেটি দেওয়া আছে। তথ্যসূত্র, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয়গুলি দেওয়া হয়েছে বইয়ের কলেবর সংক্ষিপ্ত করতে। ছয়শতাধিক টীকার, (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিক) তথ্যসূত্র নির্দেশ যথেষ্ট স্থানসাপেক্ষ।

তথ্য-উৎস বিবিধ প্রকার, প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িক ও দৈনিক পত্র পত্রিকা, মহাফেজখানা ও আদালতের নথি, মৌখিক তথ্য ও চলিত কাহিনী। সমকালীন পত্রিকার অধিকাংশই অলভ্য, সে কথাটাই জানিয়ে রাখা দরকার। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার উদ্ধৃতি সংখ্যায় বেশি, তার কারণ তাতে প্রকাশিত সংবাদের অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা নয়, ঐ পত্রিকাটির লভ্যতা। 'সমাচার দর্পণ' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সকল সংবাদ যথাক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা ও সুরেশচন্দ্র মৈত্র সংকলিত 'Selections from Janannesan' থেকে গৃহীত।

মূল পাঠের সঙ্গে টীকা ও পাঠান্তর দুই দেওয়া হয়েছে, টীকা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে না থাকলেও পাঠভেদ সংযোজনের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। নক্‌শার পূর্ববর্তী সম্পাদকের মধ্যে কেবলমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

Scanned with CamScanner

খেয়াল করেছিলেন যে দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬২) 'বহু পরিবর্তন লক্ষিত হয়।' প্রথম সংস্করণের পরিবর্ধিত সংস্করণে পরিবর্তন আয়তন বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিক হলেও দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণের (১৮৬৮) পার্থক্য, যা ব্রজেনবাবুরা উল্লেখ করেননি, বোধহয় শুধু সাহিত্য-উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য নয়। আসলে নক্‌শার মতো হালকা মেজাজের বইতে সংস্করণের পর সংস্করণে বহু পরিবর্তন ঘটাটাই কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। মনোযোগী পাঠক যিনি পাঠান্তর মিলিয়ে পড়বেন, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন হুতোম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন শুধু ভাষা বা বর্ণনাংশের নয়, চরিত্রের নাম, বাসস্থান ও কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘটনার বর্ণনাতে। তার ব্যঞ্জনা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

হুতোম 'আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি'-র মেকি ভদ্রতা ছেড়ে ক্রমশ সাহসী হয়েছেন, প্রথমে যে সব চরিত্রকে আগাগোড়া ভুল নাম ঠিকানার ছদ্মবেশ পরিয়েছিলেন, তা নিজেই খুলে, পাঠকের পক্ষে যাতে চেনা সহজ হয় তেমন সূত্র দিয়েছেন। সাত বছরের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ব্যঙ্গ চোখা করতে লঘু রসিকতা ছেঁটেছেন, তেমনি সামান্য দু-একটি শব্দের সংযোজনে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছেন আরও ভালভাবে। তাঁর ঘষামাজার পিছনে একটিই অভিপ্রায়, নিক্ষিপ্ত বাণ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। নক্‌শাকে যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের নিছক একটি উদাহরণ রূপে দেখবেন না, তাঁদের কাছে পাঠভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে বই-কী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দীর্ঘ পাঁচ বছরের বেশি সময় লেগেছে শুধু তথ্য সংগ্রহ করতে, তবু টীকার অসম্পূর্ণতার দিকে তাকালে সে পরিশ্রমের গৌরব অনেকটাই লঘু হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই ধরনের কাজে বহুজনের সাহায্য আবশ্যিক, অনেকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি, কেউ করতে পেরেছেন, কেউ পারেননি। কেউ উৎসাহিত করেছেন, অর্থহীন পণ্ডশ্রম বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা সকলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হওয়ায় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

বন্ধুবর ডঃ দেবাশিস বসু সবথেকে বেশি তথ্য ও সূত্র সরবরাহ করেছেন উদারচিত্তে, স্বীকৃতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর আনুকূল্যের ঋণ অপরিশোধ্য, নকশার টীকা রচনাকর্মে আমার সবথেকে বড় লাভ, তাঁর বন্ধুত্ব। শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোক উপাধ্যায়) বেশ কয়েকটি অজানিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সন্ধান দিয়েছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক গৌতম ভদ্র কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দার্থ জানিয়েছেন, মূলত তাঁরই ফরমায়েশে বৃহদাকৃতি ভূমিকার অবতারণা, যা সংক্ষেপে সেরে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় উৎসাহিত করেছেন, তাঁর আগ্রহে ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি ও এশিয়াটিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতাসভায় হুতোমের নক্‌শার সামাজিক পটভূমিকা বিষয়ে বলে বিদ্বৎজনের প্রতিক্রিয়া জানবার সুযোগও ঘটেছে।

অন্যান্য যাঁরা তথ্য বা তথ্যসূত্র জানিয়েছেন, শ্রীঅজিত বসু, ড. অংশুমান মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা কল্যাণী দত্ত, শ্রীতারাপদ সাঁতরা, শ্রীনিখিল সরকার, ড. পূর্ণেন্দুনাথ নাথ,

Scanned with CamScanner